أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

(Book# 92) www.motaher21.net

خُذُوا حِذْرَكُمْ

" তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর"

" Always be prepared against your enemies."

সুরা: আন-নিসা

আয়াত নং :-৭১

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا خُذُوۡا حِذۡرَکُمۡ فَانۡفِرُوۡا ثُبَاتٍ اَوِ انۡفِرُوۡا جَمِیۡعًا

হে ঈমানদারগণ! মোকাবিলা করার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকো। তারপর সুযোগ পেলে পৃথক পৃথক বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে বের হয়ে পড়ো অথবা এক সাথে।

৭১ নং আয়াতের তাফসীর:

আয়াতের প্রথমাংশে জিহাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ এবং আয়াতের দ্বিতীয় অংশে জিহাদে অংশ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে বেশকিছু শিক্ষা রয়েছে –

(১) কোন ব্যাপারে বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়।

(২) অস্ত্র সংগ্রহের নির্দেশ দেয়া হলেও এমন প্রতিশ্রুতি কিন্তু দেয়া হয়নি যে, এ অস্ত্রের কারণে তোমরা নিশ্চিতভাবেই নিরাপদ হতে পারবে । এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করাটা মূলতঃ মানসিক স্বস্তি লাভের জন্যই হয়ে থাকে।

(৩) এ আয়াতে প্রথমে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ অতঃপর জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সুশৃংখল নিয়ম বাতলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা যখন জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে, তখন একা একা বাহির হবেনা, বরং ছোট ছোট দলে বাহির হবে কিংবা (সম্মিলিত) বড় সৈন্যদল নিয়ে বাহির হবে। তার কারণ, একা একা যুদ্ধ করতে গেলে ক্ষতির আশংকা রয়েছে। শত্রুরা এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে মোটেই শৈথিল্য করে না।

উল্লেখ্য এ ভাষণটি এমন এক সময় নাযিল হয়েছিল যখন ওহোদ যুদ্ধের পরাজয়ের পর মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার গোত্রগুলোর সাহস বেড়ে গিয়েছিল এবং বিপদ আপদ চতুর্দিক থেকে মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলেছিল। সে সময় প্রায় প্রতিদিনই নানান ধরনের দুঃসংবাদ আসতো। উমুক গোত্র বিরূপ হয়ে গেছে। মুসলমানদের সাথে এক নাগাড়ে বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছিল। তাদের প্রচারকদেরকে দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে দাওয়াত দিয়ে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা হতো। মদীনার বাইরে তাদের জানমালের কোন নিরাপত্তা ছিল না। এ অবস্থায় এসব বিপদের ঢেউয়ের আঘাতে যাতে ইসলামের তরী ডুবে না যায় সেজন্য মুসলমানদের পক্ষ থেকে একটি জোরদার প্রচেষ্টা ও জীবন উৎসর্গকারী সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়োজন ছিল।

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে কাফির-মুশরিক শত্রুদের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সর্তক থাকতে নির্দেশ প্রদান করতঃ এক দলের পর আরেক দল বা একত্রে সকলকে শত্রুদের বিরুদ্ধে বের হবার আদেশ দিচ্ছেন। এ নির্দেশ শত্রুদের বিরুদ্ধে সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা শামিল করে। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য অস্ত্র সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ, তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করতে কৌশল গ্রহণ ও অর্জন সর্বোপরি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ গ্রহণ করা। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ

অর্থাৎ বিচ্ছিন্নভাবে যে এক দল তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে আরেক দল অবস্থান করবে, অথবা প্রয়োজনে সকলেই বের হয়ে যাবে।

তারপর মুনাফিকদের কথা উল্লেখ করেছেন। তারা যখন মু'মিনদের ওপর কোন বিপদ-আপদ দেখে যে, মু'মিনরা যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়েছে বা আহত হয়েছে তখন তারা বলে, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ যে আমরা সেখানে যাইনি। এদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ أَخَذْنَآ أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ)

“তোমার মঙ্গল হলে তা তাদেরকে পীড়া দেয় এবং তোমার বিপদ ঘটলে তারা বলে, 'আমরা তো পূর্বেই আমাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম'এবং তারা উৎফুল্লচিত্তে সরে পড়ে।”(সূরা তাওবাহ ৯:৫০)

পক্ষান্তরে যদি মু'মিনরা কোন বিজয় লাভ করে বা গনীমত পায় তাহলে আফসোস করে বলে হায় যদি সেখানে থাকতাম তাহলে সফলকাম হতাম। মু'মিনদের সফলতা দেখে তারা ব্যথিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ)

“যদি কোন কল্যাণ তোমাদের কাছে আসে তবে তাদের খারাপ লাগে।”(সূরা আলি-ইমরান ৩:১২০)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে তাঁর পথে যুদ্ধ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করছেন। কারণ যারা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় যুদ্ধ করবে তারা শহীদ হোক বা বিজয় লাভ করুক উভয় অবস্থায় মহা প্রতিদান পাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَي الْحُسْنَيَيْنِ)

“বল: 'তোমরা আমাদের দু'টি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষা করছ।”(সূরা তাওবাহ ৯:৫২)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়, আল্লাহ তা'আলার ওপর বিশ্বাস করে এবং রাসূলকে সত্য বলে জানে সে ব্যক্তির দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিয়েছেন। হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা তাকে গনীমত বা প্রতিদানসহ সেই

বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন যে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসছিল। (সহীহ বুখারী হা: ৩১২৩, সহীহ মুসলিম হা: ১৯৭৬)

তাই মু'মিনদের উচিত সদা শত্র"দের ব্যাপারে সর্তক থাকা, আর প্রয়োজনানুপাতে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার পথে যুদ্ধ করা।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. মু'মিনদের সর্বদা শত্র"দের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকা আবশ্যক।

২. মু'মিনদের আল্লাহ তা'আলার পথে যুদ্ধ করার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা উচিত।

৩. মুনাফিকরা সর্বদা মু'মিনদের অমঙ্গল কামনা করে।

৪. সর্বোত্তম মৃত্যু শহীদি মৃত্যু। আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় যুদ্ধ করলে উভয় অবস্থায় মহাসাফল্য।

সুরা: আন-নিসা

আয়াত নং :-৯৪

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰۤى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًاۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاؗ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌؕ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْاؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য বের হও তখন বন্ধু ও শত্রুর মধ্যে পার্থক্য করো এবং যে ব্যক্তি সালামের মাধ্যমে তোমাদের দিকে এগিয়ে আসে তাকে সঙ্গে সঙ্গেই বলে দিয়ো না যে, তুমি মুমিন নও। যদি তোমরা বৈষয়িক স্বার্থলাভ করতে চাও তাহলে আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য অনেক গণীমাতের মাল রয়েছে। ইতিপূর্বে তোমরা নিজেরাও তো একই অবস্থায় ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। কাজেই তোমরা অনুসন্ধান করে পদক্ষেপ গ্রহণ করো। তোমরা যা কিছু করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত।

৯৪ নং আয়াতের তাফসীর:

শানে নুযূল:

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীদের পাশ দিয়ে বানী সুলাইম গোত্রের এক লোক তার ছাগল নিয়ে যাচ্ছিল। সে সাহাবীদেরকে সালাম দিল। সাহাবীগণ বলল: সে আমাদের থেকে বাঁচার জন্য সালাম দিয়েছে। তাই সাহাবীগণ তাকে ধরে হত্যা করল, ছাগলগুলো নিয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আগমন করল। তখন

(أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ إِذَا ضَرَبْتُمْ...)

আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তিরমিযী হা: ৩০৩০, আহমাদ হা: ২৪৬২, সহীহ)

(فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ)

‘কারণ আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য প্রচুর গনীমত রয়েছে।’ অর্থাৎ এ কিছু ছাগল থেকে আল্লাহ তা‘আলার নিকট অনেক উত্তম সম্পদ রয়েছে। যা আল্লাহ তা‘আলা ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্যশীলদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন।

তারপর আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, তোমরাও তো পূর্বে এরূপ ছিলে। তোমরা ঈমান এনেছিলে কিন্তু প্রকাশ করতে পারনি। আজ তোমরা শক্তিশালী হয়েছ বলে যাচাই-বাছাই না করে যা ইচ্ছা তাই করবে। আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। অতএব তোমাদের দায়িত্ব হল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নেয়া।

ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে ‘আসসালামু আলাইকুম’ বাক্যটি মুসলমানদের জন্য ঐতিহ্য ও পরিচিতির প্রকাশ ছিল। একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে দেখলে এ বাক্যটি ব্যবহার করতো এই অর্থে, “আমিও তোমার দলভুক্ত, তোমার বন্ধু ও শুভাকাংখী। আমার কাছে তোমার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা ছাড়া আর কিছুই নেই। কাজেই তুমি আমার সাথে শত্রুতা করো না এবং আমার পক্ষ থেকেও তোমার জন্য শত্রুতা ও ক্ষতির কোন আশঙ্কাই নেই।” সেনাবাহিনীর মধ্যে যেমন সাংকেতিক শব্দ (Password) হিসেবে একটি শব্দ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় এবং রাতে এক সেনাবাহিনীর লোক অন্য সেনাবাহিনীর কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় এই শব্দ ব্যবহার করে যাতে সে শত্রু সেনাবাহিনীর লোক নয় একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায়, ঠিক তেমনি সালাম শব্দটিকেও মুসলমানদের মধ্যে সাংকেতিক শব্দ হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। বিশেষ করে সেই সময় এই সাংকেতিক শব্দটি ব্যবহারের গুরুত্ব আরো বেশী ছিল এজন্য যে, সে সময় আরবের নওমুসলিম ও কাফেরদের মধ্যে পোশাক, ভাষা বা অন্য কোন জিনিসের ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল না। ফলে একজন মুসলমানের পক্ষে প্রথম দৃষ্টিতে অন্য একজন মুসলমানকে চিনে নেয়া খুব কঠিন ছিল।

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াতো আরো জটিল। মুসলমানরা যখন কোন শত্রুদলের ওপর আক্রমন করতো এবং সেখানের কোন মুসলমান তাদের তরবারীর নীচে এসে যেতো তখন আক্রমণকারী মুসলমানদেরকে সে জানাতে চাইতো, আমি তোমাদের দ্বীনী ভাই। একথা জানাবার জন্য সে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে চীৎকার করে উঠতো। কিন্তু মুসলমানরা তাতে সন্দেহ করতো। তারা মনে করতো, এ ব্যক্তি কোন কাফের, নিছক নিজের জান বাঁচাবার জন্য সে এই কৌশল অবলম্বন করেছে। এজন্য অনেক সময় তারা এ ধরনের লোককে হত্যা করে বসতো এবং তার মালমাত্তা গণীমাত হিসেবে লুট করে নিতো। নবী ﷺ এই ধরনের ব্যাপারে প্রতি ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোরভাবে তিরস্কার ও শাসন করেছেন। কিন্তু তবুও এ ধরনের দুর্ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ কুরআন মজীদে এই সমস্যার সমাধান পেশ করেছেন।

এখানে এই আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান হিসেবে পেশ করেছে তার ব্যাপারে তোমাদের এ ধরনের হালকাভাবে ফয়সালা করার কোন অধিকার নেই যে, সে নিছক প্রাণ বাঁচাবার জন্য মিথ্যা বলছে। সে সত্যবাদীও হতে পারে, মিথ্যাবাদীও হতে পারে। প্রকৃত সত্য তো জানা যাবে অনুসন্ধানের পর। অনুসন্ধান ছাড়াই তাকে ছেড়ে দেবার ফলে যদি একজন কাফেরের মিথ্যা বলে প্রাণ বাঁচাবার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তাকে হত্যা করার পরে তোমাদের হাতে একজন নিরপরাধ মু'মিনের মারা পড়ারও সম্ভাবনা থাকে। কাজেই ভুলবশত একজন কাফেরকে ছেড়ে দেয়া ভুলবশত মু'মিনকে হত্যা করার চেয়ে অনেক ভালো।

অর্থাৎ তোমাদেরও এমন এক সময় ছিল যখন তোমরা কাফের গোত্রগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলে। জুলুম নির্যাতনের ভয়ে ইসলামের কথা বাধ্য হয়ে গোপন রাখতে। ঈমানের মৌখিক অঙ্গীকার ছাড়া তোমাদের কাছে তার আর কোন প্রমাণ ছিল না। এখন আল্লাহর অনুগ্রহে তোমরা সামাজিক জীবন যাপনের সুবিধা ভোগ করছো। তোমরা এখন কাফেরদের মোকাবিলায় ইসলামের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার যোগ্যতা লাভ করেছো। কাজেই যেসব মুসলমান এখনো প্রথম অবস্থায় আছে তাদের ব্যাপারে কোমল ব্যবহার ও সুবিধাদানের নীতি অবলম্বন না করলে তোমাদেরকে যে অনুগ্রহ করা হয়েছে তার প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে না।

আয়াতের এ বাক্যে একটি সাধারণ নির্দেশ রয়েছে যে, মুসলিমরা কোন কাজ সত্যাসত্য যাচাই না করে শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে করবে না। বলা হচ্ছে- তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর কর, তখন সত্যাসত্য অনুসন্ধান করে সব কাজ করো। শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করলে প্রায়ই ভুল হয়ে যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিমরূপে পরিচয় দেয়, কালেমা পাঠ করে কিংবা অন্য কোন ইসলামী বৈশিষ্ট্য যথা আযান, সালাত ইত্যাদিতে যোগদান করে, তাকে মুসলিম মনে করা প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য। তার সাথে মুসলিমদের মতই ব্যবহার করতে হবে এবং সে আন্তরিকভাবে মুসলিম হয়েছে না কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, একথা প্রমাণ করার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ও স্মরণযোগ্য যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে, কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী তাকে কাফের বলা বা মনে করা বৈধ নয়। এর সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, কুফরের নিশ্চিত লক্ষণ, এরূপ কোন কথা বা কাজ যতক্ষণ তার দ্বারা সংঘটিত না হবে, ততক্ষণ তার ইসলামী স্বীকারোক্তিকে বিশুদ্ধ মনে করা হবে এবং তাকে মুসলিমই বলা হবে। তার সাথে মুসলিমের মতই ব্যবহার করা হবে এবং তার আন্তরিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করার অধিকার কারো থাকবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলাম ও ঈমান প্রকাশ করার সাথে সাথে

কিছু কুফরী কালেমাও উচ্চারণ করে, অথবা প্রতিমাকে প্রণাম করে কিংবা ইসলামের কোন অকাট্য ও স্বতঃসিদ্ধ নির্দেশ অস্বীকার করে কিংবা কাফেরদের কোন ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে; যেমন গলায় পৈতা পরা ইত্যাদি, তাকে সন্দেহাতীতভাবে কুফরী কাজকর্মের কারণে কাফের আখ্যা দেয়া হবে। তবে তাকে এ ব্যাপারে শরী’আতের জ্ঞান দিতে হবে এবং তার যদি এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে, সে সন্দেহ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে হবে। তারপরই কেবল তাকে কাফের বলা যাবে। নতুবা ইয়াহুদী ও খৃষ্টান সবাই নিজেকে মুমিন-মুসলিম বলতো। মুসায়লামা কায্যাব শুধু কালেমার স্বীকারোক্তিই নয়, ইসলামী বৈশিষ্ট্য যথা আযান, সালাত ইত্যাদিরও অনুগামী ছিল। আযানে ‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর সাথে ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’ ও উচ্চারণ করতো। কিন্তু সাথে সাথে সে নিজেকেও নবী-রাসূল ও ওহীর অধিকারী বলে দাবী করতো, যা কুরআন ও সুন্নাহর প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ। এ কারণেই তাকে দ্বীনত্যাগী সাব্যস্ত করা হয় এবং সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাকে হত্যা করা হয়। তবে শর্ত এই যে, ঐ লোকের কাজটি যে ঈমান বিরোধী, তা অকাট্য ও নিশ্চিত হতে হবে। আর তাকে সেটা জানাতে হবে এবং তার সন্দেহ থাকলে তা শরী’আতের দৃষ্টিতে অপনোদন করতে হবে।

এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কেউ মুসলিম বলে নিজেকে পরিচয় দিলে অনুসন্ধান ব্যতিরেকে তার উক্তিকে কপটতা মনে করা কোন মুসলিমের জন্যই বৈধ নয়। এ ব্যাপারে কোন কোন সাহাবী থেকে ভুল সংঘটিত হওয়ার কারণে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, বনী-সুলাইমের এক ব্যক্তি একদিন ছাগলের পাল চরানো অবস্থায় একদল মুজাহিদ সাহাবীর সম্মুখে পতিত হয়। সে মুজাহিদ দলকে সালাম করল । তার পক্ষ থেকে এ বিষয়ের কার্যতঃ অভিব্যক্তি ছিল যে, সে একজন মুসলিম। কিন্তু মুজাহিদরা মনে করলো যে সে শুধু জীবন ও ছাগলের পাল রক্ষা করার জন্যই এ প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। এ সন্দেহে তারা লোকটিকে হত্যা করে তার ছাগলের পাল অধিকার করে নিলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত করলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। এতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ইসলামী পদ্ধতিতে তোমাকে সালাম করে, তার সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ করো না যে, সে প্রতারণাপূর্বক নিজেকে মুসলিম বলে প্রকাশ করেছে। তার অর্থ-সম্পদ যুদ্ধলব্ধ মাল মনে করে অধিকারে নিওনা। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/২৩৫, মুসনাদে আহমাদঃ ১/২২৯, ২৭২, ৩২৪, তিরমিযীঃ ৩০৩০] আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে এ দু’টি ঘটনা ছাড়া আরো দুটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে, কিন্তু সুবিজ্ঞ তাফসীরবিদগণ বলেছেন, এসব রেওয়ায়েতের মাঝে কোন বিরোধ নেই। সমষ্টিগতভাবে কয়েকটি ঘটনাও আয়াতটি নাযিলের কারণ হতে পারে।

অর্থাৎ তোমাদেরও আগে এমন এক সময় ছিল যখন তোমরা কাফের গোত্রগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলে। যুলুম নির্যাতনের ভয়ে ইসলামের কথা বাধ্য হয়ে গোপন রাখতে। ঈমানের মৌখিক অঙ্গীকার ছাড়া তোমাদের কাছে তার আর কোন প্রমাণ ছিল না। এখন আল্লাহর অনুগ্রহে তোমরা সামাজিক জীবন-যাপনের সুবিধা ভোগ করছ। কাফেরদের মুকাবেলায় ইসলামের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার যোগ্যতা লাভ করেছ। কাজেই যেসব মুসলিম এখনো প্রথম অবস্থায় আছে তাদের ব্যাপারে কোমল ব্যবহার ও সুবিধা দানের নীতি অবলম্বন না করলে তোমাদেরকে যে অনুগ্রহ করা হয়েছে, তার প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে না।

☆ আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত 'ধারাবাতুম ফি সাবিলিল্লাহ' শব্দের অর্থ আল্লাহর পথে সফর অথাৎ জিহাদ, অথবা সৎব্যবসা বাণিজ্য, অথবা অন্যকোন কাজ যা পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয় সবই বুঝায়। যদিও আয়াতটি জিহাদ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে তবুও উল্লেখিত শব্দে ব্যাপক অর্থ প্রকাশের সুযোগ রয়েছে।

'আসসালামু আলাইকুম' মুসলমানদের চিহ্ন ও সভ্যতার অংগ হিসেবে পরিচিত। একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে দেখে এই শব্দটি বলে এই অর্থে যে ....

....

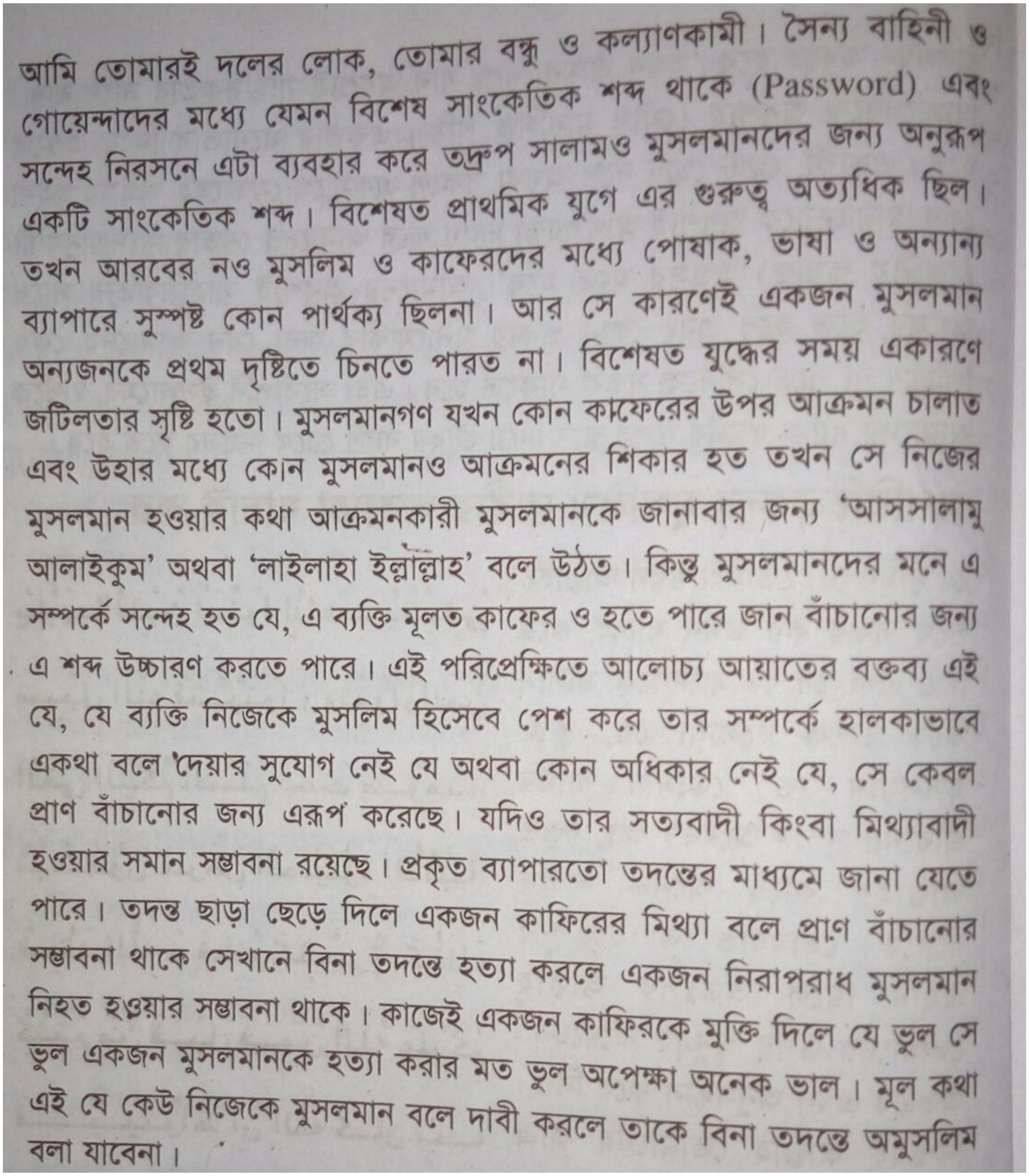

আমি তোমারই দলের লোক, তোমার বন্ধু ও কল্যাণকামী। সৈন্য বাহিনী ও গোয়েন্দাদের মধ্যে যেমন বিশেষ সাংকেতিক শব্দ থাকে (Password) এবং সন্দেহ নিরসনে এটা ব্যবহার করে তদ্রুপ সালামও মুসলমানদের জন্য অনুরূপ একটি সাংকেতিক শব্দ। বিশেষত প্রাথমিক যুগে এর গুরুত্ব অত্যধিক ছিল। তখন আরবের নও মুসলিম ও কাফেরদের মধ্যে পোষাক, ভাষা ও অন্যান্য ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন পার্থক্য ছিলনা। আর সে কারণেই একজন মুসলমান অন্যজনকে প্রথম দৃষ্টিতে চিনতে পারত না। বিশেষত যুদ্ধের সময় একারণে জটিলতার সৃষ্টি হতো। মুসলমানগণ যখন কোন কাফেরের উপর আক্রমন চালাত এবং উহার মধ্যে কোন মুসলমানও আক্রমনের শিকার হত তখন সে নিজের মুসলমান হওয়ার কথা আক্রমনকারী মুসলমানকে জানাবার জন্য 'আসসালামু আলাইকুম' অথবা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে উঠত। কিন্তু মুসলমানদের মনে এ সম্পর্কে সন্দেহ হত যে, এ ব্যক্তি মূলত কাফের ও হতে পারে জান বাঁচানোর জন্য এ শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য এই যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম হিসেবে পেশ করে তার সম্পর্কে হালকাভাবে একথা বলে দেয়ার সুযোগ নেই যে অথবা কোন অধিকার নেই যে, সে কেবল প্রাণ বাঁচানোর জন্য এরূপ করেছে। যদিও তার সত্যবাদী কিংবা মিথ্যাবাদী হওয়ার সমান সম্ভাবনা রয়েছে। প্রকৃত ব্যাপারতো তদন্তের মাধ্যমে জানা যেতে পারে। তদন্ত ছাড়া ছেড়ে দিলে একজন কাফিরের মিথ্যা বলে প্রাণ বাঁচানোর সম্ভাবনা থাকে সেখানে বিনা তদন্তে হত্যা করলে একজন নিরাপরাধ মুসলমান নিহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই একজন কাফিরকে মুক্তি দিলে যে ভুল সে ভুল একজন মুসলমানকে হত্যা করার মত ভুল অপেক্ষা অনেক ভাল। মূল কথা এই যে কেউ নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করলে তাকে বিনা তদন্তে অমুসলিম বলা যাবেনা।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. যুদ্ধ ও জিহাদের জন্য ভ্রমণ করা শরীয়তসম্মত।

২. সকল কাজে যাচাই-বাছাই করা অবশ্যক।

৩. দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হওয়াকে নিন্দা করা হল।

৪. অন্যের অবস্থা দেখে উপদেশ গ্রহণ করা উচিত।

সুরা: আন-নিসা

আয়াত নং :-৫৯

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَیْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ
الْيَوْمِ الْاٰخِرِؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রসূলের আর সেই সব লোকের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী। এরপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে তাকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান এনে থাকো। এটিই একটি সঠিক কর্মপদ্ধতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটিই উৎকৃষ্ট।

তাফসীর :

[أُولُو الأمر (উলুল আম্র) বলতে কেউ বলেছেন, নেতা ও শাসকগণ। কেউ বলেছেন, উলামা ও ফুক্বাহাগণ। অর্থের দিক দিয়ে উভয় শ্রেণীর মান্যবরদেরকেই বুঝানো যেতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রকৃত আনুগত্য তো আল্লাহর প্রাপ্য। কারণ তিনি বলেছেন, [أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ] "জেনে রাখো, সৃষ্টি করা এবং নির্দেশদান তাঁরই কাজ।" (আ'রাফঃ ৫৪)

[إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ] "বিধান দেওয়ার অধিকার শুধু আল্লাহরই।" (ইউসুফঃ ৪০)

কিন্তু রসূল (সাঃ) যেহেতু মহান আল্লাহর ইচ্ছার এক নিষ্ঠাবান প্রকাশক এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথগুলো (মানুষের কাছে) তুলে ধরার ব্যাপারে তিনি তাঁর প্রতিনিধি, এ জন্যই মহান আল্লাহর স্বীয় আনুগত্যের সাথে সাথে রসূল (সাঃ)-এর আনুগত্য করাকেও ওয়াজেব করে দেন এবং বলেন যে, রসূলের আনুগত্য করলে প্রকৃতপক্ষে তাঁরই আনুগত্য করা হয়। [مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ] "যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল।" (নিসাঃ ৮০)

এ থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হাদীসও কুরআনের মত দ্বীনের দলীল। এ ছাড়া আমীর ও শাসকের আনুগত্য করাও জরুরী। কারণ, হয় তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশের বাস্তবায়ন করেন অথবা সকল

মানুষের কল্যাণ সাধনের ব্যবস্থাপনা ও তার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমীর ও শাসকের আনুগত্য করা জরুরী হলেও তা একেবারে শর্তহীনভাবে নয়, বরং তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের শর্তসাপেক্ষ। আর এই কারণেই أَطِيْعُوا الله এর পরই أَطِيْعُوا الرَّسُوْل বলেছেন। কেননা, এই উভয় আনুগত্যই স্বতন্ত্র ও ওয়াজেব। পক্ষান্তরে وَأَطِيْعُوا أُولِي الأَمْر বলেননি, কারণ উলুল আম্র বা শাসকদের আনুগত্য স্বতন্ত্র নয়। আর হাদীসে বলা হয়েছে যে, ((لا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ)) "আল্লাহর অবাধ্যাচরণে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই।" (মিশকাত ৩৬৯৬, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে, "আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নেই।" (মুসলিম ১৮৪০নং)

বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, ((إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوْفِ)) "আনুগত্য হবে কেবল ভালো কাজে।" (বুখারী ৭১৪৫)

'শাসকের কথা শুনতে হবে ও তাঁর আনুগত্য করতে হবে যতক্ষণ না (আল্লাহ ও তাঁর রসূলের) অবাধ্যতা হবে।' আলেম-উলামার ব্যাপারটাও অনুরূপ। (যদি তাঁদেরকে শাসকদের মধ্যে শামিল করা হয়) অর্থাৎ, তাঁদের আনুগত্য এই জন্যই করতে হবে যে, তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের যাবতীয় বিধি-বিধান বর্ণনা করেন এবং তাঁর দ্বীনের জন্য পথ-প্রদর্শকের কাজ করেন। বুঝা গেল যে, দ্বীনি বিষয়ে এবং দ্বীন সম্পর্কীয় কার্যকলাপে আলেম-উলামা শাসকদের মতই এমন কেন্দ্রীয়-মর্যাদাসম্পন্ন যে, জনসাধারণ তাঁদের প্রতি রুজু করে থাকে। তবে তাঁদের আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত করা যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা জনসাধারণকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা শুনাবেন। কিন্তু তাদের বিপথগামী (বা কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীতগামী) হওয়ার কথা স্পষ্ট হলে তাঁদের আনুগত্য করা যাবে না। বরং এই অবস্থায় তাঁদের আনুগত্য করলে বড় অপরাধ ও গুনাহ হবে।

আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ, কুরআনের দিকে রুজু করা এবং এখন রসূলের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ হল, (সহীহ) হাদীসের দিকে রুজু করা। বিবাদী সমস্যার সমাধানের জন্য এটা হল অতি উত্তম এক মৌলিক নীতি। আর এই মৌলিক নীতি থেকে এ কথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তৃতীয় কোন ব্যক্তিত্বের আনুগত্য ওয়াজেব নয়। যেমন, ব্যক্তি অনুকরণ অথবা নির্দিষ্ট করে কারো অন্ধানুকরণ করার সমর্থকরা তৃতীয় আর এক আনুগত্যকে জরুরী সাব্যস্ত করেছে। আর কুরআনের আয়াতের প্রকাশ্য বিরোধী তৃতীয় এই আনুগত্য মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ এক উম্মতে পরিণত করার পরিবর্তে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন উম্মতে পরিণত করেছে এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে প্রায় অসম্ভব করে দিয়েছে।

‘উলুল আমরা’ আভিধানিক অর্থে সে সমস্ত লোককে বলা হয়, যাদের হাতে কোন বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত থাকে। সে কারণেই ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা, মুজাহিদ ও হাসান বসরী রাহিমাহুমাল্লাহ্ প্রমূখ মুফাস্‌সিরগণ ওলামা ও ফোকাহা সম্প্রদায়কে ‘উলুল আমর’ সাব্যস্ত করেছেন। তারাই হচ্ছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়েব বা প্রতিনিধি। তাদের হাতেই দ্বনী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত। মুফাসসিরীনের অপর এক জামা’আত–যাদের মধ্যে আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমূখ সাহাবায়ে কেরামও রয়েছেন– বলেছেন যে, উলুল আমর’ এর অর্থ হচ্ছে সে সমস্ত লোক, যাদের হাতে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত। ইমাম সুদ্দী এ মত পোষণ করেন। এছাড়া তাফসীরে ইবন কাসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ শব্দটির দ্বারা (ওলামা ও শাসক) উভয় শ্রেণীকেই বোঝায়। কারণ, নির্দেশ দানের বিষয়টি তাঁদের উভয়ের সাথেই সম্পর্কিত। আল্লামা আবু বকর জাস্‌সাস এতদুভয় মত উদ্ধৃত করার পর বলেছেন, সঠিক ব্যাপার হলো এই যে, এতদুভয় অর্থই ঠিক। কারণ, ‘উলুল আমর’ শব্দটি উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অবশ্য এতে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন যে, ‘উলুল আমর’ বলতে ফকীহ্‌গণকে বোঝানো যেতে পারে না। তার কারণ, (أُولُوا الأَمْر) (উলুল আমর) শব্দটি তার শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে সে সমস্ত লোককে বোঝায়, যাদের হুকুম বা নির্দেশ চলতে পারে। বলাবাহুল্য, এ কাজটি ফকীহগণের নয়। প্রকৃত বিষয় হলো এই যে, হুকুম চলার দুটি প্রেক্ষিত রয়েছে।

(এক) জবরদস্তিমূলক। এটা শুধুমাত্র শাসকগোষ্ঠী বা সরকার দ্বারাই সম্ভব হতে পারে।

(দুই) বিশ্বাস ও আস্থার দরুন হুকুম মান্য করা। আর সেটা ফকীহ্‌গণই অর্জন করতে পেরেছিলেন এবং যা সর্বযুগে মুসলিমদের অবস্থার দ্বারা প্রতিভাত হয়। দ্বীনী ব্যাপারে সাধারণ মুসলিমগণ নিজের ইচ্ছা ও মতামতের তুলনায় আলেম সম্প্রদায়ের নির্দেশকে অবশ্য পালনীয় বলে সাব্যস্ত করে থাকে। তাছাড়া শরীআতের দৃষ্টিতেও সাধারণ মানুষের জন্য আলেমদের হুকুম মান্য করা ওয়াজিবও বটে। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রেও ‘উলুল আমর’-এর প্রয়োগ যথার্থ হবে।

এ আয়াতটি ইসলামের সমগ্র ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের বুনিয়াদ। এটি একটি ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের প্রথম নম্বর ধারা। এখানে নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলো স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হয়েছে।

একঃ ইসলামের জীবন ব্যবস্থায় আসল আনুগত্য লাভের অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ। একজন মুসলমানের সর্বপ্রথম পরিচয় হচ্ছে সে আল্লাহর বান্দা। এরপর সে অন্য কিছু। মুসলমানের ব্যক্তিগত জীবন এবং মুসলমানদের সমাজ ব্যবস্থা উভয়ের কেন্দ্র ও লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য করা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর নির্দেশ মেনে চলা। অন্যান্য আনুগত্য ও অনুসৃতি কেবল মাত্র তখনই গৃহীত হবে যখন তা আল্লাহর আনুগত্য অনুসৃতির বিপরীত হবে না। বরং তার অধীন ও অনুকূল হবে। অন্যথায় এই আসল ও মৌলিক আনুগত্য

বিরোধী প্রতিটি আনুগত্য শৃংখলকে ভেঙ্গে দূরে নিক্ষেপ করা হবে। এ কথাটিকেই নবী ﷺ নিম্নোক্ত বক্তব্যে পেশ করেছেনঃ لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ অর্থাৎ স্রষ্টার নাফরমানি করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।

দুইঃ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে, রসূলের আনুগত্য। এটি কোন স্বতন্ত্র ও স্বয়ং সম্পূর্ণ আনুগত্য নয়। বরং আল্লাহর আনুগত্যের এটিই একমাত্র বাস্তব ও কার্যকর পদ্ধতি। রসূলের আনুগত্য এ জন্য করতে হবে যে, আল্লাহর বিধান ও নির্দেশ আমাদের কাছে পৌঁছার তিনিই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। আমরা কেবলমাত্র রসূলের আনুগত্য করার পথেই আল্লাহর আনুগত্য করতে পারি। রসূলের সনদ ও প্রমাণপত্র ছাড়া আল্লাহর কোন আনুগত্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আর রসূলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নামান্তর। নিম্নোক্ত হাদীসে এই বক্তব্যটিই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছেঃ مَن أَطَاعَنِي فَقَد أَطَاعَ الله وَ مَن عَصَانِي فَقَد عَصى الله যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে আসলে আল্লাহর আনুগত্য করলো এবং যে ব্যক্তি আমার নাফরমানি করলো সে আসলে আল্লাহর নাফরমানি করলো। একথাটিই কুরআনে সামনের দিকে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে পেশ করা হয়েছে।

তিনঃ উপরোল্লিখিত দু'টি আনুগত্যের পর তাদের অধীনে তৃতীয় আর একটি আনুগত্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আওতাধীনে মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব। সেটি হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে থেকে 'উলিল আমর' তথা দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারীদের আনুগত্য। মুসলমানদের সামাজিক ও সামষ্টিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে দায়িত্ব সম্পন্ন ও নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি মাত্রই ' উলিল আমর '-এর অন্তর্ভুক্ত। তারা মুসলমানদের মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তাগত ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী উলামায়ে কেরাম বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হতে পারেন, আবার দেশের শাসনকার্য পরিচালনাকারী প্রশাসকবৃন্দ হতে পারেন, অথবা আদালতে বিচারের রায় প্রদানকারী শেখ সরদার প্রধানও হতে পারেন। মোটকথা যে ব্যক্তি যে কোন পর্যায়েই মুসলমানদের নেতৃত্বদানকারী হবেন তিনি অবশ্যি আনুগত্য লাভের অধিকারী হবেন। তার সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে মুসলমানদের সামাজিক জীবনে বাধা-বিপত্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যাবে না। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, তাকে মুসলিম দলভুক্ত হতে হবে এবং আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হতে হবে। এই আনুগত্যের জন্য এই শর্ত দু'টি হচ্ছে অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক। কেবলমাত্র উল্লেখিত আয়াতটির মধ্যভাগে এ সুস্পষ্ট শর্তটি সংশ্লিষ্ট হয়নি বরং হাদীসেও নবী করীম ﷺ পরিপূর্ণ ব্যাপকতার সাথে দ্ব্যর্থহীনভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। যেমন নিম্নোক্ত হাদীসগুলো দেখা যেতে পারেঃ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ (بخارى ومسلم) নিজের নেতৃবৃন্দের কথা শোনা ও মেনে চলা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য, তা তার পছন্দ হোক বা না হোক, যে পর্যন্ত না তাকে নাফরমানির হুকুম দেয়া হয়। আর যখন তাকে নাফরমানির হুকুম দেয়া হয় তখন তার কিছু শোনা ও আনুগত্য করা উচিত নয়। (বুখারী ও মুসলিম) لاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةٍ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ (بخارى ومسلم) আল্লাহ ও রসূলের নাফরমানীর ক্ষেত্রে কোন আনুগত্য নেই, আনুগত্য করতে হবে শুধুমাত্র 'মারুফ' বা বৈধ ও সৎকাজে।" (বুখারী ও মুসলিম) يَكُونُ عَلَيكُم أُمَرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ فقَالُوا أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ لاَ مَا صَلَّوْا (مسلم) নবী ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের ওপর এমন সব লোকও শাসন কর্তৃত্ব চালাবেন যাদের অনেক কথাকে তোমরা মারুফ (বৈধ) ও অনেক কথাকে মুনকার (অবৈধ) পাবে। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তাদের মুনকারের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে, সে দায়মুক্ত হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তি তা অপছন্দ করেছে, সেও বেঁচে গেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্টি হয়েছে এবং তার অনুসরণ করেছে সে পাকড়াও হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, তাহলে এ ধরনের শাসকদের শাসনামলে কি আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো না? নবী ﷺ জবাব দেনঃ না, যতদিন তারা নামায পড়তে থাকবে (ততদিন তাদের সাথে যুদ্ধ

করতে পারবে না)।–(মুসলিম) অর্থাৎ নামায পরিত্যাগ করা এমন একটি আলামত হিসেবে বিবেচিত হবে, যা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যাবে যে, তারা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে। এ অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ন্যায়সঙ্গত হবে। নবী ﷺ বলেনঃ شِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ مَالَ لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ (مسلم) "তোমাদের নিকৃষ্টতম সরদার হচ্ছে তারা যারা তোমাদেরকে ঘৃণা করে এবং তোমরা তাদেরকে ঘৃণা করো, তোমরা তাদের প্রতি লানত বর্ষণ করতে থাকো এবং তারা তোমাদের প্রতি লানত বর্ষণ করতে থাকে। সাহাবীগণ আরজ করেন, হে আল্লাহর রসূল। যখন এ অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন কি আমরা তাদের মোকাবিলা করার জন্য মাথা তুলে দাঁড়াবো না? জবাব দেনঃ না, যতদিন তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করতে থাকবে! না, যতদিন তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করতে থাকবে!" এই হাদীসটি ওপরে বর্ণিত শর্তটিকে আরও সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। ওপরের হাদীসটি থেকে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, যতদিন তারা ব্যক্তিগত জীবনে নামায পড়তে থাকবে ততদিন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। কিন্তু এই হাদীসটি থেকে একথা জানা যায় যে, নামায পড়া মানে আসলে মুসলমানদের সমাজ জীবনে নামাযের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ কেবলমাত্র তাদের নিজেদের নিয়মিতভাবে নামায পড়াটাই যথেষ্ট হবে না বরং এই সঙ্গে তাদের আওতাধীনে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে সেখানেও কমপক্ষে "ইকামাতে সালাত' তথা নামায প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাপনা থাকা জরুরী বিবেচিত হবে। তাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা তার আসল প্রকৃতির দিক দিয়ে যে একটি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা এটি হবে তারই একটি আলামত। অন্যথায় যদি একটুকুও না হয়, তাহলে এর অর্থ হবে যে, তারা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের শাসন ব্যবস্থাকে উলটে ফেলার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানো মুসলমানদের জন্য বৈধ হয়ে যাবে। একথাটিকেই অন্য একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ নবী ﷺ আমাদের থেকে অন্যান্য আরো বিভিন্ন বিষয়ের সাথে এ ব্যাপারেও অঙ্গীকার নিয়েছেনঃ أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ، إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا ، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ "অর্থাৎ আমরা আমাদের সরদার ও শাসকদের সাথে ঝগড়া করবো না, তবে যখন আমরা তাদের কাজে প্রকাশ্য কুফরী দেখতে পাবো যার উপস্থিতিতে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে পেশ করার জন্য আমাদের কাছে প্রমাণ থাকবে। " (বুখারী ও মুসলিম)

চারঃ চতুর্থ যে মূলনীতিটি এ আয়াতটি থেকে স্থায়ী ও চূড়ান্তভাবে স্বিরীকৃত হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আল্লাহর হুকুম ও রসূলের সুন্নাত হচ্ছে মৌলিক আইন ও চূড়ান্ত সনদ (Final Authority) মুসলমানদের মধ্যে অথবা মুসলিম সরকার ও প্রজাদের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসার জন্য কুরআন ও সুন্নাতের দিকে ফিরে আসতে হবে। কুরআন ও সুন্নাত এ ব্যাপারে যে ফায়সালা দেবে তাঁর সামনে মাথা নত করে দিতে হবে। এভাবে জীবনের সকল ব্যাপারে কুরআন ও রসূলের সুন্নাতকে সনদ, চূড়ান্ত ফয়সালা ও শেষকথা হিসেবে মেনে নেয়ার বিষয়টি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা তাকে কুফরী জীবন ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়। যে ব্যবস্থায় এ জিনিসটি অনুপস্থিত থাকে সেটি আসলে একটি অনৈসলামী ব্যবস্থা।

এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করে বলে থাকেন যে, জীবনের যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালার জন্য কুরআন ও সুন্নাতের দিকে ফিরে যাওয়া কিভাবে সম্ভব হতে পারে? কারণ মিউনিসিপ্যালিটি, রেলওয়ে, ডাকঘর ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় সম্পর্কিত কোন নিয়ম-কানুনের উল্লেখই সেখানে নেই। কিন্তু এ সংশয়টি আসলে দ্বীনের মূলনীতি সঠিকভাবে অনুধাবন না করার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। একজন মুসলমানকে একজন কাফের থেকে যে বিষয়টি আলাদা ও বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করে সেটি হচ্ছে, কাফের অবাধ স্বাধীনতার দাবীদার। আর মুসলমান মূলত

আল্লাহর বান্দা ও দাস হবার পর তার রব মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে যতটুকু স্বাধীনতা দান করেছেন শুধুমাত্র ততটুকু স্বাধীনতা ভোগ করে। কাফের তার নিজের তৈরী মূলনীতি ও আইন-বিধানের মাধ্যমে তার যাবতীয় বিষয়ের মীমাংসা করে। এসব মূলনীতি ও বিধানের ক্ষেত্রে কোন ঐশী সমর্থন ও স্বীকৃতির প্রয়োজন আছে বলে সে মনে করে না এবং নিজেকে এর মুখাপেক্ষীও ভাবে না। বিপরীত পক্ষে মুসলমান তার প্রতিটি ব্যাপারে সর্বপ্রথম আল্লাহ ও তাঁর নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিকে ফিরে যায়। সেখান থেকে কোন নির্দেশ পেলে সে তার অনুসরণ করে। আর কোন নির্দেশ না পেলে কেবল মাত্র এই অবস্থায়ই সে স্বাধীনভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে। এক্ষেত্রে তার এই কর্মের স্বাধীনতার মূলভিত্তি একথার ওপরই স্থাপিত হয় যে, এই ব্যাপারে শরীয়াত রচয়িতার পক্ষ থেকে কোন বিধান না দেয়াই একথা প্রমাণ করে যে তিনি এক্ষেত্রে কর্মের স্বাধীনতা প্রদান করেছেন।

কুরআন মজীদ যেহেতু নিছক একটি আইনের কিতাব মাত্র নয় বরং একই সঙ্গে এটি একটি শিক্ষা ও উপদেশমূলক গ্রন্থও, তাই প্রথম বাক্যে যে আইনগত মূলনীতির বিবরণ দেয়া হয়েছিল এই দ্বিতীয় বাক্যে তার অন্তর্নিহিত কারণ ও যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে দু'টি কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, উপরোল্লিখিত চারটি মূলনীতি মেনে চলা ঈমানের অপরিহার্য দাবী। একদিকে মুসলমান হবার দাবী করা এবং অন্যদিকে এই মূলনীতিগুলো উপেক্ষা করা, এ দু'টি পরস্পর বিরোধী জিনিসের কখনো একত্র সমাবেশ হতে পারে না। দ্বিতীয়, এই মূলনীতিগুলোর ভিত্তিতে নিজেদের জীবন বিধান নির্মাণ করার মধ্যেই মুসলমানদের কল্যাণ নিহিত। কেবলামাত্র এই একটি জিনিসই তাদেরকে দুনিয়ায় সত্য-সরল পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে এবং এর মাধ্যমেই তারা পরকালেও সফলকাম হতে পারে। যে ভাষণে ইহুদীদের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার ওপর মন্তব্য করা হচ্ছিল এই উপদেশ বাণীটি ঠিক তার শেষে উক্ত হয়েছে। এভাবে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মত দ্বীনের এই মূলনীতিগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে যেভাবে অধপতের গভীর গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তা থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। যখন কোন জনগোষ্ঠী আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের হিদায়াত পেছনে ফেলে দিয়ে এমন সব নেতা ও সরদারের আনুগত্য করতে থাকে, যারা আল্লাহ ও রসূলের হুকুম মেনে চলে না এবং নিজেদের ধর্মীয় নেতা ও রাষ্ট্রীয় শাসকদের কাছে কুরআন ও সুন্নাতের সনদ ও প্রমাণপত্র জিজ্ঞেস না করেই তাদের আনুগত্য করতে থাকে তখন তারা এই বনী ইসরাঈলদের মতোই অসৎ ও অনিষ্টকর কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে এমন সব দোষ-ত্রুটি সৃষ্টি হয়ে যায়, যার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়।